জীবনকে দেখতেন অন্যভাবে

সেলিনা চৌধুরী

আমার বান্ধবী ডানা। ওরই বড় ভাই হিসেবে চিনতাম, জানতাম শাহাদত চৌধুরীকে। প্রাণবন্ত, জলি মাইন্ডের একজন। আবার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। বন্ধুর ভাই, সেই হিসেবেই যতটুকু দেখা ততটুকুই। ডানাদের বাসায় গেলে বা ওদের বিয়েশাদি বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানেই দেখা হতো, এর বেশি না। আলাদাভাবে কখনো কোনো কথাও হয়নি। কিন্তু লক্ষ করতাম। ওরা ভাইবোনরা কি নিয়ে যেন হাসিঠাট্টা করতো, কানাকানি করতো আর হাসতো, আমি ঠিক বুঝতাম না।

আমাদের বিয়েটা ঠিক হয় অনেকটা হঠাৎ করেই। একটা মজার ঘটনা দিয়েই এর সূত্রপাত। ডানার বড় ভাই মোরশেদ ভাইয়ের বিয়ে। ডানা আগে থেকেই বলে রেখেছিল বিয়েতে খুব মজা হবে। আমি যেন সব সময় তাদের সঙ্গে থাকি। একদিন আমরা সবাই মিলে মেয়ের বাড়িতে পাঠানোর জিনিসপত্রগুলো সাজাচ্ছিলাম। অনেক জিনিস দেখে আমি বললাম, বিয়ে করলে তো অনেক মজা, প্রচুর জিনিস পাওয়া যায়। কথাটা মুখ থেকে পড়তে না পড়তেই ডানা লুফে নিয়ে বললো, বিয়ে করবি আমার ভাইকে? তাহলে তোকে অনেক জিনিস দেবো।

> আমাকে অনেক ভালোবাসতো শাহাদত চৌধুরী। কিন্তু মুখে কখনো বলতো না। আমি বলতাম, বলো না কেন? বলতো, এটা কি বলার বিষয়? এটা তোমাকে বুঝে নিতে হবে, এটা তোমার মনে রাখতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে

আমাদের বিয়েটা দেন জাহানারা খালা (জাহানারা ইমাম)। তিনিই আমার গার্জিয়ানদের সঙ্গে, আমার বাবা ও মামাদের সঙ্গে কথা বলে বিয়ে ঠিক করেন। আমাদের এনগেইজমেন্টটা হঠাৎ করেই হয়। জাহানারা খালা চেয়েছিলেন একবারে বিয়েটা দিয়ে দিতে। ২৯ মার্চ ছিল রুমীর জন্মদিন। খালা চাইলেন ২৯ মার্চেই আমাদের বিয়েটা হোক। কিন্তু শাহাদত চাইলো না। হৈচৈ লাগিয়ে দিলো। বললো, আম্মা (উনি জাহানারা খালাকে আম্মা বলে ডাকাতেন) আমি এভাবে তাড়াহুড়ো করে করবো না। যা করবো, সুন্দরভাবে গুছিয়ে করবো। পরে ঐ ২৯ মার্চে আমাদের এনগেইজমেন্ট হলো। ১৯৭৭ সাল ছিল সেটা। এরপর ওই বছরেরই ১৬ অক্টোবর বিয়ে।

অনেক গোছানো ও সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ ছিলো ও। বিয়ের আগে কয়েকটা মাস সময় নিলো সুন্দরভাবে সবকিছু গুছিয়ে নেয়ার জন্যই। ঘর ঠিক করলো। সেটা সুন্দর করে সাজিয়ে নিলো। কী চমৎকার ছিল, একটা মেয়ে তার নতুন সংসারে গিয়ে সব গুছিয়ে নেয়। আর আমি পেয়েছি সাজানো গোছানো চমৎকার একটা ঘর... একটা সংসার। সবই করেছিলো ও নিজের হাতে। যদিও শাহাদত প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে বিয়ে করবে না। যে ভবঘুরে জীবন, এভাবেই কাটিয়ে দিবে সারাটা জীবন। কিন্তু যখন সিদ্ধান্ত নিল বিয়ে করবে, তখন বললো, বিয়ে যখন করবো পারফেক্টলি করবো। কোনো ফাঁক থাকবে না কোথাও। সেভাবেই কিন্তু হলো সবকিছু।

একান্ত সময়ে দু'জনে

বাজারটাও করতো নিজের হাতে। সেটাও ছিল একটা দেখার মতো বিষয়। বাজার থেকে যখন ফিরতো, তার পেছনে কয়েকজন লোক। প্রত্যেকের হাতে-মাথায় বোঝাই করা জিনিস। কতো কি যে কিনতো। লোকজনকে খাওয়াতে খুব পছন্দ করতো। সব সময় আমাকে বলতো, লোকের বাড়িতেই লোক আসবে, তাদের আদর-যত্ন করতে হবে। এটাই নিয়ম। লোকজন আড্ডা মারবে, হৈচৈ করবে। এটা খুব পছন্দের বিষয় ছিল তার। বাজার থেকে বড় বড় মাছ কিনতো। এই মাছ কিনতে সে সোয়ারীঘাট চলে যেত। শেষের দিকে বাজার করতো আগোরায়। এটা তার একটা বিনোদন ছিল। ট্রলি

ধরে হাঁটতো। এটা-সেটা কিনতো। অনেকের সঙ্গে দেখা হতো। খুব এনজয় করতো এটা। আমি সঙ্গে থাকলেও সবকিছু কিনতো তার পছন্দমতোই।

বাচ্চাদের ব্যাপারেও ছিল অসম্ভব যত্নশীল। প্রচণ্ড ভালোবাসতো বাচ্চাদের। ওরা যখন ছোট ছিল অনেক কিছুই ও নিজের হাতে করে দিত। আমি মাঝে মাঝে ঘুম থেকে দেরিতে উঠতাম। ও তখন এশাকে নিজের হাতে রেডি করে স্কুলে নিয়ে যেত। বলতাম, আমি নিয়ে যাই। ও বলতো, না। তোমাকে রেডি হতে হবে। অনেক ঝামেলা। আমি দিয়ে আসি। এভাবে অনেক কিছুই ও নিজ দায়িত্বে নিয়ে নিতো।

শাহাদত চৌধুরীর সবকিছু আমার ভালো লাগতো। তার বিপরীতে কখনোই যেতাম না। সে যেটা ঠিক মনে করতো সেটাই মেনে নিতাম। তার যেটা ভালো লাগতো সেটা করতেই আমি ভালোবাসতাম। অন্য রকম একটা মানুষ ছিল। জীবনকে দেখতো অন্যভাবে কঠিন জিনিসটাও সহজ করে নিতো। জীবনে অনেক ঝড়ঝাপটা এসেছে। আমার মধ্যে বিশ্বাসটা এমনভাবে ছিল, শাহাদত চৌধুরীর সেই ক্ষমতা আছে এটা মোকাবিলা করার। ও ঠিকই ম্যানেজ করে নিবে।

একটা ঘটনা মনে পড়ছে। বছরে তো কয়েকবারই তার বিদেশ যাওয়া পড়তো। একবার মেক্সিকোতে গেল। হঠাৎ একদিন সেখান থেকে ফোন করে জানালো, তার ডলার, পাসপোর্ট সবই হারিয়ে গেছে। এটাও বললো, সে না খেয়ে আছে। শুনে আমার খুব মনখারাপ হলো। মেক্সিকোতে তখন বাংলাদেশ দূতাবাস ছিল না। শাহাদত চৌধুরী কিন্তু ঠিকই সব ম্যানেজ করে দেশে ফিরলো।

আরেকবার ইরানে গেল। পনের দিন। কোনো খবর নেই। না ফোন, না অন্য কোনো যোগাযোগ। তখন এশা হবে। আমার সে কি টেনশন। হঠাৎ এক রাতে বাইরে গাড়ির হর্ন। গেট খোলা হলো। দেখা গেল ও এসে হাজির। আমি অনুযোগ করলাম। বললো, ভালোই তো ছিলাম। তাই আর ফোন করিনি।

আমাদের বাসায় ১ বৈশাখে একটা অনুষ্ঠান করার রেওয়াজ চালু করলো শাচৌ। অনেক বছর ধরে এ অনুষ্ঠান হচ্ছে। নানা রকম দেশী ফল, ইলিশসহ নানা রকম মাছ, খই, মুড়ি, মোয়া, নানা রকম দেশীয় খাবারের আয়োজন করতো। আমাকে ইলিশ পোলাও রান্না করতে বলতো, আমি করতাম।

এটা চালু হলো সাশার বয়স তখন ১ বছর। ওকে নিয়ে আমরা বটমূলে গেলাম। কিন্তু এতো লোক দেখে সাশার সে কি কান্না। তখন আমরা বাসায় চলে এলাম।

সুখে সংসার করে গেছি ২৮টি বছর

বিয়ের আসরে ১৬ অক্টোবর ১৯৭৭

আমাকে নানাভাবেই সে খুশি রাখতো। আমি মুখ কালো করে বসে থাকি এটা সে কখনোই চাইতো না। কোনো বিষয় নিয়ে রাগ হলে ও-ই আমার রাগ ভাঙতো। বলতো, আমি এমনই। আমার ওপর রাগ করে থাকা কি ঠিক? আমি আর রাগ করে থাকতে পারতাম না।

অনেক ব্যস্ত থাকলেও আমাকে সময় দিতো ঠিকই। খুব কেয়ার করতো। সে চুপচাপ কোথাও বসে থাকতো সেটা আমি পছন্দ করতাম না। তার দুরন্তপনা আমার বেশি ভালো লাগতো। আমি তাকে দেখতে চাইতাম একজন হিরো হিসেবে। সে বসে থাক, এটা কখনোই চাইতাম না। এই কর্মঠ লোকটা শেষ সময় যেভাবে কাটালো সেটা আমি কোনোভাবেই মানতে পারতাম না...।

শাহাদত চৌধুরী শুধু তার সন্তান বা কলিগদের না, আমাকেও অনেক কিছু শেখাতো। বলতো, সেলিনা এটা করো না। ওটা করো...।

শাহাদত চৌধুরী আমাকে অনেক উপহার কিনে দিতো। তার কাছে থেকে প্রথম উপহার পাই একটি ওয়েডিং রিং। বিয়ের রাতে দিয়েছিল। এরপর সব সময়ই বেশি দিতো পারফিউম। কতো রকম যে পারফিউম দিতো। বিভিন্ন ম্যাগাজিন দেখে দেখে কোনটা নতুন বের হয়েছে...। এই তো সেই দিন। অক্টোবরে আমাদের ম্যারেজডেতে আমি বললাম, তুমি তো আর চলতে পারছো না... আমাকে কে পারফিউম কিনে দেবে....। সারপ্রাইজ দিতে সে খুব পছন্দ করতো। আমাদের পঁচিশতম ম্যারেজডেতে একটা হীরের আংটি কিনে সাশার কাছে রেখে দিলো। ওই দিন আমাকে সেটা দিয়ে সারপ্রাইজ দিলো।

আমাদের পরিবারের সঙ্গে শাহাদত চৌধুরীর সম্পর্ক ছিল খুবই ভালো। সে ছিল আমাদের গার্জিয়ান। আমার বাবা-মার খুব পছন্দের মানুষ। আমার ভগ্নিপতি বিচারক কামরুল সেদিন কাঁদতে কাঁদতে বলছিলো, শাহাদত ভাইয়ের মতো এমন একজন ব্রিলিয়ান্ট লোকের এতো তাড়াতাড়ি মারা যাওয়া কোনোভাবেই উচিত নয়। মেনে নিতে পারছি না।

শাহাদত চৌধুরীর একটা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল সবাইকে আপন করে নেয়ার। আরেকটি ক্ষমতা ছিল, যে জিনিসটা আমরা

আজ বুঝতাম, তা কিন্তু শাহাদত চৌধুরী ছয় মাস আগেই বুঝতে পারতো। কোনো বিষয়ে যদি আমরা একমত না হতাম, বলতাম তুমি যা বলছ সবই ঠিক হবে এমন তো নয়। কিন্তু একটা সময় আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পারতাম। দেখতাম শাহাদত চৌধুরী যা বলেছে সেটাই ঠিক।

সাশার বিয়েতে সে খুব মজা করেছিল। সাশার স্বামী সায়মনকে খুব পছন্দ করেছিল ও। বিয়ে নিয়ে সে কি তার টেনশন, কি করবে, কীভাবে করবে। তার বন্ধুরা বললেন, তোমাকে এসব নিয়ে ভাবতে হবে না। দেখো সব কী করে হয়। কী ভালোবাসা তাদের। সবকিছুই ঠিকমতো হলো। চোখের একটা সমস্যার কারণে সে সবকিছু আবছা দেখতো। সায়মনকে সে ঠিকমতো দেখতে পারতো না। চোখের অপারেশন করে এলো ব্যাংকক থেকে। এয়ারপোর্টে পৌঁছেই সে বললো- কোথায়, আমার জামাই কোথায়। আসো তোমাকে দেখি।

শাহাদত চৌধুরী যা কিছু ভালো, তার সবকিছুই পছন্দ করতো। ভালো ছবি দেখা, বই পড়া, গান শোনা। বিশেষ করে গানটা খুব পছন্দ করতো। আমরা বিয়ের পরপর অনেকটা সময় পার করে দিতাম শুধু গান শুনে। শেষ সময়টাও যখন সে একা থাকতো, গান শুনেই সময় কাটাতো। আর ছবি দেখায় প্রায়োরিটি পেত আর্ট মুভি। বেড়াতেও খুব পছন্দ করতো। দেশ-বিদেশের যেকোনো জায়গায়। আর সবচেয়ে পছন্দের ছিল আমাদের সঙ্গে সময় কাটানো।

শাহাদত চৌধুরী কিন্তু বুঝতে পেরেছিলো সে আর থাকবে না। কিছুদিন আগেও বলেছিল, আমি আর নেই। তাই সেদিন যখন বলছিলাম তোমার শরীরটা একটু ভালো হলে আমরা সবাই মিলে ইন্ডিয়া বা ব্যাংকক কোথাও ঘুরতে যাবো। আমার কথা শুনে শাহাদত চৌধুরী এমনভাবে হাসলো, বোঝাই গেল সে হাসির অর্থ। ওই হাসি দিয়ে সে বুঝিয়ে দিলো। কেন শুধু শুধু বলছো এসব কথা...।

শাহাদত চৌধুরী চলে গেলে আমি একা হয়ে যাবো। তখন আমার কী হবে.... এটা নিয়ে সে খুব ভাবতো। সাশাদের বলতো, তোমার মায়ের সঙ্গে তোমরা থেকো। তাকে একা রেখো না। আমাকে বলতো, তুমি এখানেই থেকো। শ্যামলি যেও না, তোমার মেয়েদের সঙ্গে থেকো।

আমাদের বাসায় সবসময়ই বন্ধু-বান্ধবের আনাগোনা ছিল। যারা বাসায় আসতেন বলতো, তোমাদের বাসায় এলে খুবই ভালো লাগে। কী সুন্দর সংসার তোমাদের।

আমাকে অনেক ভালোবাসতো শাহাদত চৌধুরী। কিন্তু মুখে কখনো বলতো না। আমি বলতাম, বলো না কেন? বলতো, এটা কি বলার বিষয়? এটা তোমাকে বুঝে নিতে হবে, এটা তোমার মনে রাখতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে। আমি সত্যিই তার এই অপরিসীম ভালোবাসা নিয়ে সুখে সংসার করে গেছি ২৮টি বছর। বাকিটা সময় কাটিয়ে দেবো তার এই ভালোবাসা নিয়েই।

বাবা, তোমার জন্য

সাশা চৌধুরী

'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'- গানের লাইনে ঘুম পাড়াতেন বাবা। শাহাদত চৌধুরী আমার বাবা। আমার গর্ব, আমার চেতনা, আমার বন্ধু, আমার পৃথিবী। বাবা আমাকে শেখাতেন কিভাবে মানুষকে ভালোবাসতে হয়, সম্মান করতে হয়।

এ ছবিটি ছিল বাবার খুব প্রিয়

বাবা ভালোবাসতেন মানুষের মহত্ত্ব, মানুষের মনুষ্যত্বকে। বলতেন মানুষ মানুষের জন্য। ছোটবেলা থেকে আমি গল্প শুনেছি যুদ্ধের, দেশের; আমার বাবার চোখের পানিতে দেখেছি মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা, চোখের আনন্দে দেখেছি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন। মুক্তিযুদ্ধের গল্পে মনে হয়েছে আমিও একজন যোদ্ধা ছিলাম। বড় হয়ে যখন স্কুলে কেউ শুনতেন শাহাদত চৌধুরীর মেয়ে, জিজ্ঞাসা করত মুক্তিযোদ্ধা বিচিত্রার শাহাদত চৌধুরী! বাবাকে প্রশ্ন করতাম তিনি কিভাবে জানেন 'তুমি বিচিত্রায় কাজ কর'। তিনি হেসে বলতেন, 'আমি বলে এসেছিলাম'। পরে বুঝতে পারি তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব।

বাবা আমার সামনে অন্যকে কখনোই আমার প্রশংসা করতেন না। শুনেছি আড়ালে আমার প্রশংসা করতেন। একদিন সাপ্তাহিক ২০০০-এ ফ্যাশন সমন্বয়কারী হিসেবে NTVতে আমার একটি Interview প্রচার হয়। সেখানে আমি বলেছিলাম, কর্মব্যস্ত জীবনে আমাদের নিজেদের নিয়ে ভাবতে সময় দেয় ফ্যাশন। কথাটা শুনে বাবা চোখের পানি নিয়ে বলেছিলেন, খুবই ভালো একটা কথা বলেছো মা। বাবার মুখে এতো বড়ো Compliment পাবো সত্যি ভাবিনি।

বাবার মন খোলা বইয়ের মতো। যা মনে হয়, তাই করতেন। তার সব কথাই হয়তো সবাই লিখেছেন।

মেয়ে হিসেবে আমিও কিছু জানাতে চাই। শাহাদত চৌধুরী আচার বনাতেন। চাচীরা বাবার কাছ থেকে Recepe নিতেন। কোরবানি ঈদ এলে তিনি তৈরি করতেন Cold Beef. আমাদের দুবোনের সঙ্গে কার্টুন দেখতেন। Tom & Jerry ও সিন্ডেরেলা তার পছন্দের। বাগান করতেন। আমার একটা ময়না পাখি ছিলো। সেটাকে প্রতিদিন সকালে ছড়া শেখাতেন, 'ভোর হলো দোর খোলো'। ময়না কথাটা শিখেছিলো এবং প্রতি সকালে বাবার গলার আওয়াজ পেলে সে ছড়াটা বলত। বাবা অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন। দেশ-বিদেশে ঘুরে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন মুখোশ। পারিবারিক জীবন তার সাজানো গোছানো- সার্থক।

বাবা শাহাদত চৌধুরী একটু অন্য রকম। বাবা আমার বন্ধু। একটা বন্ধুকে যা বলা যায়, বাবাকে তাই বলতাম। তিনি শুনতেন, হাসতেন। নিজের কিছু সিক্রেটও শেয়ার করতেন। আমার হাসবেন্ড সায়মান বিয়ের আগে থেকেই আমাদের পরিচিত। আমার পছন্দেই বাবা তার সঙ্গে আমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। আমাকে অনেক বুঝিয়েছিলেন বন্ধুত্ব আর প্রেম এক নয়। প্রেম নাও থাকতে পারে। বন্ধু-বন্ধুত্ব কখনোই শেষ হয় না। বন্ধু হও, প্রেম সেখানেই হবে। জীবনের অনেক কঠিন কথা বাবার মুখে খুব সহজেই শিখেছি।

অনেক কথা বাবাকে নিয়ে বলার আছে। মনের মাঝে আমার অনেক কষ্ট লুকিয়ে আছে। এই কষ্ট বলার জন্য সব সময় বাবার কাছেই যেতাম। আজকে অনেক Miss করছি বাবা তোমাকে। প্রতিটা শব্দে বাবাকে মনে হচ্ছে। বাবা বলতেন, বাঙালিরা Miss করে না। কারণ বাংলা অভিধানে Miss-এর কোনো অর্থ নেই।

আমি বাবাকে Miss করব না। গর্ব করব। বাবা তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকবে, আমাদের অহংকারে।

চোখের দেখা প্রাণের কথা সেকি ভোলা যায়

এষা চৌধুরী

আমি আগে থেকেই বলে দিচ্ছি, আমার লেখা ভালো নয়। আমি কোনো দিন লিখিনি। আমাকে এক মাস আগে বাবা বলেছিলেন, 'মামণি তুমি লেখ, আমি তো আছিই Editor মানুষ। তোমাকে সব Free Edit করে দেবো।' আমি বাবার সঙ্গে অনেক ঝগড়া করে আর লিখিনি। কিন্তু হঠাৎ এখন খুব লিখতে ইচ্ছে করছে। তাই কলম নিয়ে বসলাম। এখন মনে হচ্ছে যে আমার লেখা কে Edit করবে!

আজ আমি যে লিখতে বসেছি তা শুধু বাবার স্মৃতিচারণ নয়। কাগজ ও কলম ছিল বাবার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমি এখন যত কলম চালাচ্ছি, ততই মনে ইচ্ছে যে তিনি আমার পাশেই বসে আছেন।

সবাই তাকে চেনেন শাহাদত চৌধুরী হিসেবে। আপনজন বন্ধুবান্ধব তাকে সম্বোধন করতেন শা.চৌ. বলে। তিনি একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা। কিছুদিন আগে তার নতুন এক নামের সঙ্গে পরিচিত হলাম- কলমযোদ্ধা। তবে আমার কাছে তার সবচাইতে বড় পরিচয়- বাবা।

শাহাদত চৌধুরী যে শুধুই আমার বাবা। আমাদের দুই বোনের সঙ্গে তার আচরণ আর দশটা মধ্যবিত্ত বাবার মতো। তার ব্যক্তিত্বের অন্য সত্তাগুলো আমাদের সম্পর্কের মাঝে প্রবেশ করতো না। আমাদের সঙ্গে তিনি শুধুই প্রিয় বাবা।

বাবার সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে আছে নানান কথায়, গানে, ছন্দে ও ঘটনায়। সেখান থেকেই তুলে ধরছি কিছু কিছু টুকরো ছোট ঘটনা।

আজ আমি যে লিখতে বসেছি তা শুধু বাবার স্মৃতিচারণ নয়। কাগজ ও কলম ছিল বাবার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমি এখন যত কলম চালাচ্ছি, ততই মনে ইচ্ছে যে তিনি আমার পাশেই বসে আছেন

প্রতি সকালে আমাকে ঘুম থেকে তুলে স্কুলের জন্যে তৈরি করে দিতেন। এমনিতেই তার স্বভাব ছিলো খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা। ছোটবেলায় সকাল ৭টায় গান গেয়ে 'আমার ময়না পাখিটা কই, আমার টিয়া পাখিটা কই, সকাল হয়েছে আমার পাখিটা ওঠো'- নিজের কথায় ও গানে তুলে দিতেন। আমার নাস্তার দায়িত্বও নিয়েছিলেন তিনি। চা, রুটি ও ডিম ছিলো আমার সকালবেলার খাবার।

মনে পড়ে ক্লাস ফাইভে পড়া সময়কার একটি ঘটনা। ক্লাস ফাইভে পড়া অবস্থায় পড়ে ফেললাম শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' ও 'পরিণিতা'। মহা খুশি হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, আমি তার মতো হয়েছি। অনেক গর্ববোধ করলাম, আমি বাবার মতন। 'দেবদাস' পড়ে রাগ হলো আমার। বাবাও বললেন একই কথা। তিনি আরো বললেন, দেবদাসে চরিত্রের দৃঢ়তা নেই। প্রেমে ভেঙে পড়লে চলবে না। প্রত্যেকের হওয়া উচিত সাহসী। বললেন জীবনকে ভালোবাসার অন্য অনেক গল্প। জীবনে হতে হবে অ্যাডভেঞ্চারাস। প্রেমের সম্পর্কে বিশ্বাস, সাহস ও দায়িত্ববোধ থাকতে হয়- তাও শিখেছি বাবার কাছেই। বাবা ছিলেন সত্য, সুন্দর ও প্রেমের পূজারী।

বাবার একটি কবিতার লাইন খুবই প্রিয় ছিলো- 'হিমালয় থেকে সুন্দরবন হঠাৎ বাংলাদেশ'। সুকান্ত আমার বাবার প্রিয় কবিদের একজন। এই কবিতা আবৃতি করে যতবার শোনাতেন, ততবারই গলা ভারী ও চোখ ভিজে যেতো তার। অন্তর থেকে একটি অদ্ভুত দেশপ্রেম ছিল যা আমি এই সামান্য শব্দ সম্ভারে বোঝাতে পারব না। বাংলাদেশ তার 'মা'। 'মা'কে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতেন, দেখছেন ও দেখবেন। তিনি মারা যাবার মাত্র সপ্তাহখানেক আগে আমি একটি এ্যাকুরিয়ামে কিছু মাছ পোষা শুরু করলাম। ভীষণ হেসে বললেন, হ্যাঁ এই বুড়ি বয়সে। এইসব পাগলদের মতো কি পালা শুরু করলা।' মাছগুলো এখনও আছে, শুধু বাবাই নেই।

বাবার মতো আমি হয়তো কখনোই হতে পারব না। কিন্তু বাবা বলতেন, 'চেষ্টা না করে হাল ছেড়ো না। সাধ্যের সবটুকু দিয়েই চেষ্টা কর, যদি না হয় যা পেয়েছো তাতেই খুশি হও।' আমি চেষ্টা করব, আমার বাবার মতোই একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার। বাবা নেই, তবে আছে তার স্বপ্ন, দেশকে ঘিরে হাজার হাজার স্বপ্ন।

স্বপরিবারে : আমরা যখন ছোট

আমি আজ প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি তার মতো একজন সফল মানুষ হবো। দেশ গড়ার স্বপ্নে আমিও শরিক হব। বাবাকে নিয়ে এখন আর দুঃখ করব না। আমি জানি, শাহাদত চৌধুরী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু চেষ্টা করা তো সম্ভব।

বাবা

সায়মন মানসুর

আমি শাহাদত চৌধুরীর জামাতা। ছোটবেলায় পিতা-মাতা হারিয়েছিলাম। ছোট ছিলাম, বুঝিনি পিতৃহারা মাতৃহারা কী। এখন দ্বিতীয়বার পিতা হারালাম। আমার শ্বশুর বিয়ের পরে ফোনে বলেছিলেন, 'আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করো। সাশা, এষা আর তুমি একই।' কথায় এত আপন টান ছিল যে বাবাকে কখনোই শ্বশুর ভাবতে পারিনি। তিনি আমার বাবা। খুব অল্প সময় তাকে পেয়েছি। তার সঙ্গে গল্প করেছি মুক্তিযোদ্ধা ও মৌলবাদের। আমি প্রতিদিন সকালে সব নিউজ পেপার পড়ে বাবার সঙ্গে গল্প করতাম। আমার জ্ঞান আরও প্রসারিত হতো। গল্প ও উপন্যাস পছন্দ করি বলে বাবা আমাকে সব ঈদসংখ্যা ও শারদীয় সংখ্যা কিনে এনে দিতেন। কোক আমার খুব পছন্দ, তাই আমি বাসায় থাকি আর না থাকি, বাবা কোক কিনে রেখে দিতেন। শেষ কয়েক মাস বাবা বিছানায় শুয়ে থাকতেন। দাড়ি কাটতেন না। আমি একদিন দাড়ি কাটার যন্ত্র দিয়ে দাড়ি ট্রিম করে দিলাম। তিনি খুব পছন্দ করেছিলেন। পরে আমাকে ছাড়া আর কারো হাতে দাড়ি ট্রিম করতেন না। তার ধারণা, আমার মতো ভালো কেউ পারে না। হাসপাতালে নেয়ার আগের রাতে আমাকে বলেছিলেন, তোমার দাড়ি কাটার যন্ত্রটা আমাকে দিয়ে দাও। তুমি আরেকটা কিনে নাও। বাবা, তোমার জন্য ট্রিমারটা তুলে রেখেছি। জানি না ওটা আর ব্যবহার করব কি না।

এনগেইজমেন্ট অনুষ্ঠানে বা থেকে সেলিনা চৌধুরী, সায়মন মানসুর, এশা চৌধুরী, সাশা চৌধুরী এবং শাহাদত চৌধুরী

বাবার 'সাইবাবা' আমি। সায়মানের সাই' আর আদরের 'বাবা' থেকে আমার নাম দিয়েছিলেন সাইবাবা। এখন চোখ বন্ধ হলে বাবা তোমার কণ্ঠস্বরে শুধু সাইবাবা ডাক শুনি।

এক জীবন-শিল্পীর কথকতা

ফতেহ চৌধুরী

আমার সেজো ভাই শাহাদত চৌধুরীকে মুক্তিযুদ্ধের পরে আর 'সেজো ভাই' বলে ডাকতাম না- একজন সহযোদ্ধা হিসেবে, সহযোদ্ধা বন্ধুদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে 'শাচৌ' বলে ডাকতাম। শাচৌর ছিল জীবনের প্রতি প্রচন্ড ভালোবাসা, জীবন যাপনে তার ছিল অপার আনন্দ, তাই তো শাচৌ হৈ চৈ করে বেড়াতে পছন্দ করতো। সুন্দর জীবনের প্রতি ছিল প্রবল আকর্ষণ। বিচিত্রার মাধ্যমে সেই সুন্দর জীবনের স্বপ্ন আমাদের দেখাতে চেয়েছিল, তার প্রিয় বাক্য ছিল কবি শেলীর 'সত্যই সুন্দর সুন্দরই সত্য'। শাচৌ ছিল সত্যিকার অর্থে একজন জীবন-শিল্পী। তাই হয়তো শাচৌ ভালোবাসতো তো আর সাজিয়ে রাখতে চাইতো তার স্ত্রী কন্যা, জামাতা ঘেরা সুন্দর তার সংসারটাকেও।

শাচৌর মহাপ্রয়াণে আমার আবার সেই শৈশব, কৈশোর ও স্বাধীনতাপূর্ব উত্তাল ছাত্রজীবনে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে আর ডাক দিতে ইচ্ছে করছে সেই সেজো ভাইকে, যে আর্ট কলেজে পড়ার সময় বিভিন্ন আন্দোলনে আর্ট কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে আলপনা দেয়ালচিত্র এঁকে বেড়াতো, ভীষণ সুন্দর ছোট গল্প লিখত। জজ সাহেব বাবার স্নেহময় অনুশাসনে হাটখোলার বাসায় অনেক ভাইবোন ঘেরা হৈ চৈ সংসারে আমরা একসঙ্গে বড় হয়েছিলাম। সব বিষয়ে আমরা খোলামেলা আলোচনা করতাম, এমনকি বাবা মার সঙ্গেও। আমার বাবা ছিলেন ধর্মানুরাগী ও রবীন্দ্রভক্ত। আমাদের দিয়েছিলেন ধর্ম পালনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। আমাদের সবচেয়ে বড় ভাই জাহান চৌধুরী ছিল ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠন অগ্রণী শিল্প সংসদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তৎকালীন চাকরিরত অবস্থায় বাবা কখনো বড় ভাইয়ের ভাষা আন্দোলনের কাজে বাধা দেননি। বরং মনি সিং, গাজীউল হক, মতিনসহ অনেক নেতাই আমাদের বাসায় লুকিয়ে থাকতেন বা আসতেন। এ নিয়ে শাচৌর খুব গর্ব ছিল, তার অসমাপ্ত অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে এসব লিপিবদ্ধ করে গেছে।

অগত্যা, সমকাল, শনিবারের চিঠি, নতুন সাহিত্য, টাইম লুক, এবং দেশ, এইসব পত্রপত্রিকাগুলো ছড়াছড়ি ছিলো আমাদের বাড়িতে। শাচৌ এগুলো সযত্ন রাখতো। আমার বড় বোনের স্বামী ছিল শিল্পাচার্য জয়নাল আবেদীন পরবর্তীতে আর্ট কলেজে অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেন। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে শাচৌর শিক্ষক। তার প্রভাব ছিল শাচৌর ওপর ভীষণভাবে। এমনি একটা সুন্দর পরিবেশে আমরা সবাই বড় হয়ে উঠেছিলাম। শাচৌ ভর্তি হলো আর্ট কলেজে। তখন শাচৌ খুব সুন্দর ছবি আঁকতো। শাচৌর ছোট আমার বড় ছোট আপা ছিলো শাচৌর প্রিয় বন্ধু। ছোট আপা ভর্তি হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অনার্সে এবং পরের বছর আমি ভর্তি হলাম একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি অনার্সে। শিল্প-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা যেন তিন ভাই-বোনের মধ্যে আরো জমে উঠলো। শাচৌ বলতো, সাহিত্য শিল্পের বিভিন্ন শাখা নিয়ে আর আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। শাচৌ আমাকে পড়তে দিল দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অমল দাসগুপ্ত, Herbert Read, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি নানা ধরনের বই। শাচৌর প্রিয় বই ছিল যেটা আমাকে পড়তেই হলো- ভ্যানগগের জীবনীভিত্তিক অপূর্ব উপন্যাস 'Lust for Life'. আমার মাও খুব বই পড়তেন। তারা শঙ্কর মার প্রিয় লেখক। মা খুব ভালো পাঠক ছিল, এ নিয়ে শাচৌ খুব মজা করতো।

শাচৌ অল্প বয়স থেকে কচিকাঁচার মেলার অন্যতম সংগঠক ছিল। আমরা শাচৌর একান্ত অনুসারী হয়ে কচিকাঁচার মেলায় জড়িয়ে পড়ি। এই সুবাদে আমাদের বাসায় আসত শাচৌর শৈশবের বন্ধু রফিকুন নবী, আবেদ খান, দাদা ভাই, হাশেম খান, মাহবুব তালুকদারসহ আরো অনেকে। এই ভাবে পারিবারিক বন্ধু হয়ে ওঠে কবি সুফিয়া কামালের মেয়ে লুলু/টুলু, ঝিনু (শহীদ আলতাফ মাহমুদের স্ত্রী) মিনু , শিমুলসহ ওদের গোটা পরিবার। শাচৌ গর্ব করে বলতো, ও তার অপ্রকাশিত আত্মকথা লিখে গেছে- আমি বড় হয়েছি সুফিয়া কামাল, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, কবি শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, আলতাফ মাহমুদের মত অনেক ব্যক্তিত্বের স্নেহের ছায়ায়।

এরপর শাচৌর জীবনে সবচেয়ে বড় টানিং পয়েন্ট ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। আমি পালিয়ে যাই রণাঙ্গনের খোঁজে। শাচৌ জীবনে প্রথম গর্বিত হয়ে ওঠে আমার জন্যে। তারপর তিন ভাই শাচৌ, মোরশেদ, আমি হয়ে উঠি রণাঙ্গনের সাথী। হাটখোলা রোড হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের ঘাঁটি। আমাদের বোন ডানা, ঝিমলি, ছোটআপাসহ গোটা পরিবার জড়িয়ে পড়ি মুক্তিযুদ্ধে। ১৯৭১ সালের ২০শে আগস্ট গভীর রাতে হাটখোলার বাড়ি ঘিরে ফেলে পাকিস্তান আর্মি। আর আমাদের না পেয়ে ধরে নিয়ে যায় আমার সেজ বোনের স্বামী PIAতে কর্মরত বেলায়েত হোসেন চৌধুরীকে এবং নির্মম অত্যাচার চালায়। এই ২৯শে আগস্ট কালো রাত্রিতে মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিক রুমি, জুয়েল, বদি, বাকেরসহ আলতাফ মাহমুদ, আজাদকে ধরে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান আর্মির হাতে শহীদ হয়। পাকিস্তান আর্মিদের হাতে ধরা পড়ে ভাগ্য ক্রমে ছাড়া পায় চুল্লু ভাই, সামাদ ভাই, আলভী।

যুদ্ধ শেষে ফিরে আসে অন্য এক সেজ ভাই। প্রতিভাবান, বিবেকবান, মেধাবী সেজ ভাই যুদ্ধ থেকে নিয়ে আসে একটা Determination and Powerful mind. শুরু হয় বিচিত্রার মাধ্যমে তার নতুন সহযোদ্ধা মুনতাসীর মামুন, শাহরিয়ার কবির, মাহফুজ উল্লাহ, চন্দন, চিন্ময়, আবু মাসুম, মাহমুদ শফিকদের নিয়ে নতুন যুদ্ধ। সুন্দর জীবন গঠনের প্রত্যাশা। But Rest is silent. অসাম্প্রদায়িক চরম যুক্তিবাদী অথচ ভাবাবেগপূর্ণ শাচৌর সব স্বপ্ন কল্পনা যেন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। নেতৃত্বে অসততা/ব্যর্থতা, সর্বত্র অন্যায়-অবিচার আর ধর্মীয় মৌলবাদের হিংস্র উত্থান শাচৌকে মানসিকভাবে পর্যুদস্ত করে ফেলেছিল। শাচৌ ছিল Performer, কথামালায় বিশ্বাস করত না। শেষের দিকে আমরা সহযোদ্ধা ও বন্ধুরা অনেক কিছু এসে বলতাম কিন্তু শাচৌর তখন করার কিছু ছিল না। আমার একমাত্র সান্ত্বনা শাচৌর মৃত্যু সঠিক সময় হয়েছে। সুন্দরের পূজারী শাচৌকে এই অসুন্দর জীবন দেখতে হবে না।

আমার সেজভাই

ডা. মোরশেদ চৌধুরী

শাহাদত চৌধুরী আমার সেজ ভাই, বন্ধু ও পথপ্রদর্শক। যিনি আমাকে বই পড়তে উৎসাহিত করেছেন, বিভিন্ন কোণ থেকে জীবন ও মানুষকে দেখার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তার সঙ্গে সাহিত্য, রাজনীতি, Development ও সামাজিক পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, সিনেমাও দেখেছি। সিনেমা দেখার ফাঁকে ফাঁকে তার 'ফোড়ন কাটা' পরিবারের সবাইকে হাসাতো। আমাদের জীবন হাসিখুশিতে ভরাতেন।

সেজভাই হচ্ছেন আমাদের ১২ ভাই-বোনের মধ্যে ৬ নম্বর, মৃতের তালিকায় ৩। এর আগে আমার সেজবোন... ও বড় ভাই জাহান আলী চৌধুরী মারা গেছেন। জাহান আলী চৌধুরী (ভাইজান) ছিলেন ভাষাসৈনিক। তিনি ২০০০ সালে আমেরিকায় মারা যান।

শাহাদত চৌধুরী কেবল শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। ১৯৮২ সালে জাতীয় ওষুধনীতি বাস্তবায়ন ও তার প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। পরবর্তীকালে ওষুধনীতি ও ওষুধের যথাযথ প্রয়োগ বিষয়ে দেশব্যাপী প্রচারাভিযান পরিচালনার জন্য 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' নামে এক সংগঠন সৃষ্টি করেন। সেজভাই ছিলেন সবার জন্য স্বাস্থ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

এছাড়া ১৯৮৮ সালে জনমুখী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন। আমার মনে আছে, এক দিনের মধ্যে বিচিত্রা 'জনগণ স্বাস্থ্য চায়' নামে ক্রোড়পত্র বের করে।

যা ছিলো স্বাস্থ্যনীতি বিষয়ে জনগণকে অবহিত করার একটা বিরাট পদক্ষেপ।

সেজভাই বিশ্বাস করতেন, সব মানুষের তাদের দেহ ও রোগ বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ১৯৮১ সালে ডেভিড ওয়ার্নের 'যেখানে ডাক্তার নেই' বইয়ের অনুবাদে আগ্রহী ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় নিয়মিত স্বাস্থ্য কেপসুল শুরু করেন। বড় ভাইয়ের অধিকার নিয়ে আমাকে নিয়মিত স্বাস্থ্য কেপসুল লিখতে বাধ্য করতেন। তিনি বলতেন, লেখা হবে এমন, যাতে সব মানুষ বুঝতে পারে। এ উপদেশ পরবর্তীতে আমার লেখার পথিকৃত হয়েছে।

১৯৮৫ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় HIV/AIDS বিষয়ক প্রতিবেদন আমাকে লিখতে বাধ্য করেন। তিনি দুই দিনের মধ্যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে বলেন। আমি রাজি হচ্ছিলাম না। বললেন লেখ, 'দেখবি এ রোগ হবে মানবসভ্যতার প্রতি হুমকি।' তার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়নি। সাপ্তাহিক বিচিত্রায় 'প্রেম রোগ' নামে প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছিলো ১৯৮৫ সালে। সেটাই ছিলো HIV/AIDS বিষয় বাংলাদেশের পত্রিকায় প্রথম রিপোর্ট। এছাড়া আশির দশকের মাঝামাঝি সময় গুঁড়ো দুধের বিরুদ্ধে ওষুধের নেশার ওপর কভার স্টোরি করেছেন। এমন প্রতিটি বিষয় স্বাস্থ্য কর্মকান্ডের মূল বিষয়।

সেজভাই ছিলেন এ রোখা। পরাজয় মানতে রাজি নন। মনে পড়ে, ২০০১ সালে সেজভাইর পিটুইটারি টিউমার ধরা পড়ে। বাদল, বাচ্চু ও আমি তাকে দিল্লিতে নিয়ে যাই। বিদ্যাসাগর Institute of neuromedicine-এ তার gamma ray দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। মনে আছে, অপারেশনের আগের দিন হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং এক দিন পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় (সকাল ১০টা)। দুপুরে খাওয়ার পর উনি বললেন, চলো বাইরে যাই। সেদিন তাপমাত্রা ৪০° সেলসিয়াসের বেশি।

আমরা তিনজন অনেক কায়দা করে তাকে হোটেলের ঘরে ফেরালাম। কিন্তু বিকেল ৫-৬টায় বললেন, চলো চাঁদনি চকে যাবো।

গেলেন, বাজার করলেন। সেদিন রাতে হোটেলে এল আমার বন্ধু রাকেশ মোহন (যে প্রথম দিন থেকেই আমাদের সঙ্গে ছিলো এবং সেজভাই ডাকতেন রাজেস)। সেজভাই একাই বাইরে চলে গেলেন। এক ঘন্টা চলে যাবার পর ফিরে না আসায় আমরা চিন্তিত। ভাবছি পথ হারালো না তো! এসে বললেন ভুল গলিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু স্বীকার করবেন না যে পথ হারিয়েছেন।

অপারেশনে (gamma ray) তাকে উচ্চমাত্রায় Prednisolone দেওয়া হয়। দুই বছর পর শুরু হয় ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। হাড় হয়ে যায় ভঙ্গুর। গত বছর (জুলাই '০৪ সালে) পায়ের পাতার একটা হাঁড় ভেঙে যায়। তারপর শুরু হয় ওষুধের অন্যান্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। ক্রমশ এগিয়ে যান মৃত্যুর পথে।

সেজভাই, তুমি চলে গেলেও রয়ে গেছে তোমর অনুপ্রেরণা। তুমি ছিলে মানুষ তৈরির কারখানা। আমি বিশ্বাস করি, তোমার তৈরি সাহসী সহকর্মীরা তোমার আদর্শ সমুন্নত রাখবে।

তবে এটা ঠিক, মহাপ্রয়াণে আমরা কেবল পারিবারিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইনি। জাতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেজভাই, তুমি জানো যে খালেদ তার লাল চুল কালো করেছে। ও বলে, সেজ চাচা লাল চুল পছন্দ করতেন না। তুমি যা পছন্দ করতে না, আমরা সেগুলো করবো না।

স্বপ্নের ফেরিওয়ালা

জায়েদ আলমের খান

শাহাদত চৌধুরী। ব্যক্তিটিকে অসংখ্য বিশেষণে বিশেষিত করা যায়। সম্পাদক, লেখক, শিল্পী, মুক্তিযোদ্ধা, সংগঠক, কর্মী, স্বাপ্নিক, সাংস্কৃতিক ধারার প্রবর্তক.. এবং এমন আরো অসংখ্য অভিধায় চিহ্নিত করা সম্ভব। কিন্তু তাতেও একক, পূর্ণ শাহাদত চৌধুরী চিত্রায়িত হয় না। তিনি ছিলেন যাযাবর, রেনেসাঁর প্রকৃত প্রতিকৃতি। ছিলেন অল্প কয়েক স্বপ্নচারীর একজন। যারা স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতেন, দিতেন স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ। অন্তরাত্মায় বোহেমিয়ান, কিন্তু জন্ম দিয়েছেন এমন প্রতিষ্ঠানের যাকে ঘিরে অনেক বোহেমিয়ান আরো অনেক প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়েছে। শাহাদত চৌধুরীর মাঝে তার প্রতিটি বৈশিষ্ট্য, প্রতিটি ক্ষেত্র এত উজ্জ্বল ছিল যে বুঝতে কষ্ট হয় কোনটি তার প্রথম পরিচয়, কোনটি আসল শাহাদত চৌধুরী।

আমার কাছে তিনি শাহাদত চাচা। আমার নায়ক, অনুপ্রেরণাদাতা। আমার শৈশবোত্তর সময়ে যিনি নিজ জীবনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, এমনকি জীবনীশক্তি দিয়ে আমাকে কিশোর থেকে তরুণ, যুবক করেছেন। আজকে আমার সাংবাদিক হয়ে ওঠা সেটা তারই চিন্তা, হয়ত পরিকল্পনারও বাস্তবায়ন।

শাহাদত চাচার কথা উঠলেই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একাত্তরের শেষ দিকের একটি ছবি। সালদা স্টেশনের কাছে রেললাইনের ওপর এক তরুণ যোদ্ধার ছবি। কাঁধে ঝোলানো স্টেনগান, সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে বিজয়ের উচ্ছ্বাস, উল্লাস (ছবিটি তোলার কিছুক্ষণ আগেই সেক্টর-২ অনেক আলোচিত সালদা নদীর যুদ্ধটি জয় করেছিল)। এই ছবিটি হয়ে পড়ল আমার স্মৃতিপটে মুক্তিযোদ্ধার মূর্ত প্রকাশের প্রতীক। অসংখ্য ও বর্ণাঢ্য পরিচয়ে জীবনভর পরিচিত শাহাদত চাচা সবচেয়ে গর্বিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ে। তার জীবনবোধ, জীবন দর্শন সবকিছুই আবর্তিত হয়েছে, পরিপক্বতা, তীক্ষ্ণতা পেয়েছে 'একজন যোদ্ধা'কে ঘিরে। এই যোদ্ধা তিনি নিজেই।

আমার সৌভাগ্য যে আমি বেড়ে উঠেছি সময়ের নায়কদের মধ্য দিয়ে। বাবা-মা, তাদের বন্ধুরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রজন্ম। একাত্তরের গল্প শুনতে শুনতে আমার প্রায়কিশোরকাল, কিশোরকাল কেটেছে। সরাসরি যুদ্ধের খুঁটিনাটি, রণাঙ্গনের হাস্যরসের গল্প, বাঙ্কারের কথা, গেরিলাদের প্রতিদিনের রুটিন আমি শুনতাম তন্ময় হয়ে। ঘুমাতে যাবার সঙ্গী ছিল যুদ্ধের ঘটনার বর্ণনা। যে যোদ্ধারা বর্ণনা করতেন সেই সময়কে, তাদের চোখেমুখে দেখতাম উজ্জ্বল দীপ্তি। বুঝতাম এই স্বাপ্নিক চোখমুখগুলো একটি জাতির জন্য, শত্রুমুক্ত ভবিষ্যতের জন্য প্রাণ দিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন সম্মুখ সমরে।

এরা সবাই একাত্তরের নায়ক। আমার নায়ক, আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম শাহাদত চাচাকে। তার চোখের দ্যুতি কখনো কমতে দেখিনি। যুদ্ধের একই ঘটনা অনেক অনেক বার বলার পরও তার চোখে থাকত সেই প্রথমবারের দীপ্তি, উজ্জ্বলতা

এরা সবাই একাত্তরের নায়ক। আমার নায়ক, আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম শাহাদত চাচাকে। তার চোখের দ্যুতি কখনো কমতে দেখিনি। যুদ্ধের একই ঘটনা অনেক অনেক বার বলার পরও তার চোখে থাকত সেই প্রথমবারের দীপ্তি, উজ্জ্বলতা। যুদ্ধের বহু বছর পর, যখন তার সহযোদ্ধাদের অনেকেই বিভ্রান্ত, শাহাদত চাচার যোদ্ধা মন যুদ্ধ থামায়নি অন্যায়ের বিপক্ষে। সুন্দর দেশের স্বপ্ন তার চোখ, মন থেকে হারিয়ে যায়নি মুহূর্তের জন্যও।

বিচিত্রার পাতাগুলোতে দুই দশকের বেশি সময় ধরে চাচার এই স্বপ্নগুলোর শব্দ রূপান্তর হয়েছে। এই স্বপ্নে তিনি উজ্জীবিত করেছেন তরুণদের। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দিয়েছেন স্বপ্ন, স্বপ্ন দেখার প্রবণতা এবং স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার উদ্যোগ। বিচিত্রা হয়ে উঠল নতুন প্রজন্মের বন্ধু-নিত্যসঙ্গী, সুন্দর বাংলাদেশের আশা, মুখপত্র। দুঃসময়ের মুহূর্তে হাত ধরে এগিয়ে যাবার সঙ্গ, লড়াইয়ের সহজাত প্রবণতার অনুপ্রেরক।

এই অনুপ্রেরক বিচিত্রা, নেপথ্যে বিচিত্রা সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী, আমার নায়ক, আমার শাহাদত চাচা'র জীবনীশক্তি ছিল অসীম। অসম্ভবকে সম্ভব করার মানসিকতা তিনি তৈরি করে দিয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝে। অলৌকিকতায় নয়, উৎসাহ-উদ্দীপনা-স্পৃহার সন্নিবেশ ঘটাতেন তরুণ মনে।

শাহাদত চৌধুরী ছিলেন সত্যিকারের নায়ক, আমার নায়ক তো বটেই।

আমার সাংবাদিক হবার ঘটনাটা ব্যাখ্যা করেছিলাম একবার। বলেছিলাম এটা নিছক দুর্ঘটনা, হঠাৎ পাওয়া এক সুযোগ। যার আবিষ্টতায় আমি মত্ত থেকেছি এবং আছি। সত্য এটা নয়, তখন বুঝিনি। এখন বুঝতে পারছি। পরিকল্পনা করেই এটা করা হয়েছে। ঠান্ডা মাথার সিদ্ধান্ত। তবে তা আমার নয়, শাহাদত চাচার। তিন

বছর বা সাত বছর আগেরও নয় এই সিদ্ধান্ত। আমার কিশোরকালেই শাহাদত চাচা আমাকে তৈরি করার পরিকল্পনা করে ফেলেছিলেন। ক্লাস এইটে পড়ি তখন, জুলাই মাসের সে দিনটি এখনো স্পষ্ট আমার কাছে। বালক নয়, যেন আমি এক পরিপূর্ণ মানুষ- এভাবে মিশতে, ব্যবহার করতে শুরু করলেন। প্রায় নির্দেশই দিলেন বিচিত্রা অফিসে যাবার জন্য। আমাকে তার সহযোদ্ধা বানানোর প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গেল।

এক নতুন পৃথিবীতে নিয়ে গেলেন শাহাদত চাচা। দিলেন বই পড়তে, শেখালেন সেই জ্ঞান দিয়ে বিশ্বকে দেখতে। বিচিত্রা অফিসে তার ঘরে আলোচনা শুনতে শুনতে আমার দিগন্তের সীমারেখা বদলে যেতে শুরু করল। পরিচয় করিয়ে দিলেন মেধাবীদের সাথে। তাদের কাছ থেকেও শিখতাম অনেক। প্রতিবেদন, নিবন্ধ লেখার নেপথ্য আলোচনায় জড়িয়ে ফেললেন শাহাদত চাচা আমাকে। সেখানেই প্রথম বুঝতে পারি– সাংবাদিকতার জগৎ কত বিস্তৃত।

আমি সম্মোহিত হয়ে পড়ি। আজও যখন বিচিত্রা এবং পরে সাপ্তাহিক ২০০০, আমার শিক্ষালয়ের কথা মনে হয় তখন দেখি কীভাবে শাহাদত চাচা আমার সামনে খুলে দিয়েছিলেন দরজাটা। আমার মাঝে কীভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছেন স্বপ্ন, স্বপ্ন দেখবার প্রবণতা। কীভাবে তৈরি করে দিয়েছেন লড়াইয়ের মানসিকতা। এসবই হয়েছে শাহাদত চৌধুরীর ল্যাবরেটরিতে। কুসংস্কার ভাঙতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। এটা ছিল তার চ্যালেঞ্জ। অন্যদেরও সেভাবে গড়েছেন। সামনে এগিয়ে যাবার দৃঢ় প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত করেছেন সবাইকে। পেছনে আটকে থাকা ছিল মানা।

ভবিষ্যতের জন্য সুন্দর দেশের স্বপ্নচারী শাহাদত চৌধুরী কত যে সহযোদ্ধা তৈরি করেছেন, কতজনকে যে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তার হিসাব তিনি নিজেও জানেন না। শুধু সাংবাদিকতা জগতেই বিচরণ ছিল না শাহাদত চৌধুরীর মন্ত্রমুগ্ধতার। অনেক ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, নেতা, অভিনেতা, জাদুকর, নির্বাহী, ভ্যাগাবন্ডের মাঝেও ছড়িয়ে আছে তার দীক্ষার আলো। তবে শাহাদত চৌধুরীর সবচেয়ে বড় অবদান অতি সাধারণের মাঝ থেকে তিনি বের করে আনতেন অসাধারণত্ব।

শাহাদত চাচা প্রায়ই একটা কথা বলতেন তার সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ প্রসঙ্গে। বীর যোদ্ধা খালেদ তার সৈনিকদের উজ্জীবিত করার জন্য বলতেন, স্বাধীন দেশ সাবেক গেরিলাদের অভিবাদন জানায় না, সে শুধু শহীদদের সম্মান করে।

আমি সবসময় অনুভব করতাম এই কথাটি শাহাদত চাচার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা, তিনি কখনো রণাঙ্গন ছাড়েননি। 'সাবেক গেরিলা' হিসেবে তিনি কখনো অভিহিত হতে পারেন না। যে বাংলাদেশের স্বপ্নে একাত্তরে তিনি গিয়েছিলেন যুদ্ধ ময়দানে, সেই স্বপ্ন তিনি লালন করেছেন যুদ্ধোত্তর সময়েও। শহীদের তালিকায়ও আমি ফেলব না তাকে। আমি তো বিশ্বাসই করি না, তিনি নেই। মঙ্গলবারের সেই রাতে বারডেম হাসপাতালে যখন তার এক 'বেলবটম' সহযোদ্ধা ফোনে একজনকে খবর দিচ্ছিলেন 'শাহাদত ভাই আর নেই' তখনো আমি ধারণ করতে পারি না শাহাদত চাচার চির চলে যাওয়াকে। আমার বিশ্বাস তিনি আছেন। আছেন আমার বিশ্বাসে, আদর্শে। অসংখ্য তরুণ, স্বপ্নচারী, সংগ্রামে-লড়াইয়ে প্রস্তুত দেশপ্রেমিকের দীপ্তিময় চোখের কোণে।

শাহাদত চৌধুরী বেঁচে আছেন, থাকবেন তার স্বপ্নের বাংলাদেশে, পৃথিবীতে; তারই ফেরি করা স্বপ্নে, স্বপ্নের বাস্তবায়নে।

আমি আমার বড় ভাইকে হারিয়েছি

শিমুল ইউসুফ

কচিকাঁচার মেলায় যখন আমি যাই, '৬২-৬৩ সালের দিকে তখন শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি আমাদেরকে দেখে রাখতেন আমরা ঠিকমতো চলাফেরা করছি কি না বা শিখছি কিনা। সঙ্গে হাশেম ভাই ছিলেন, মুনিরুল ইসলাম, জয়নুল আবেদিন স্যার, সুফিয়া খালা, পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন, রোকণুজ্জামান দাদাভাইরা ছিলেন। আমি তখন খুব ছোট ছিলাম। অন্যদিকে আমার বাবা মারা গেছে ৬১ সালে। একারণেই আমি সবার আদর খুব বেশি পেয়েছি। যেমন আমাকে কেউ কোল থেকেই নামাতো না। কচিকাঁচার মেলায় গেলে আমি সবার কোলে কোলেই থাকতাম। খুব ছোটবেলা থেকেই গানটা জানি বলে সবাই যেন ঠান্ডা না লাগে, দইটা না খাই। আমার একটু কাশির সমস্যা ছিলো ছোটবেলা থেকেই। একটু ঠান্ডা লাগলেই কাশি হতো। শাহাদত ভাই সব সময় এগুলো খেয়াল রাখতেন আর সুফিয়া খালা বলে দিতেন আমাকে দেখে রাখতে। এত ছোট ছিলাম, তাই ক্যাম্পে গেলে থাকতাম খালার সঙ্গে কিন্তু সারাদিনের জন্য শাহাদত ভাই, হাশেম খান তারাই দেখে রাখতেন। এত ছোট ছিলাম শুধু আদর যে করতেন, এটা বুঝতাম, অসম্ভব আদর করতেন। আমার ভাইদের সঙ্গে আমার নিয়মিত দেখাও হতো না। কিন্তু শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে আজন্ম একটা সম্পর্ক ছিলো সেটা অনেক ক্ষেত্রে ভাইদের চাইতেও বেশি। আমার ভাইরা আমাকে বড় করেছেন কিন্তু যে আদরটা শাহাদত ভাই আমাকে দিয়েছেন সেটা বড় ভাইয়ের দাবি থেকে। যেমন, ফোন করতেন 'চইলা আয়'। তারপর গেলে 'ভাত খেয়ে যাবি'। না খেয়ে কখনো আসতে দিত না। ছোটবেলায় শাহাদত ভাই, নবী ভাই খুব ভাই বেশি আদর করতেন। আর তাদের কাছে আমি ছিলাম খুব যত্নে তুলে রাখার মতো একটা জিনিস যে রকম, সে রকম। ছোটবেলা থেকে গান করতাম বলে ভেবেছিলেন বড় হয়ে আমি বড় কিছু একটা হতে পারি। শাহাদত ভাইয়ের আম্মার আদর পেয়েছি অনেক। আমাদের এই পরিবারগুলোর মধ্যে কোনো ভিন্নতা ছিলো না। তাঁরা অনেকগুলো ভাইবোন ছিলেন, আমরাও তাই। খালাম্মার আদরে কখনোই মনে হতো না আমি বাইরের কেউ। নিজের সন্তানের মতোই দেখতেন। যেমন সুফিয়া খালার বাড়ি গেলেও মনে হতো না। আমি সে বাড়ির কেউ না। তেমনি দুলাল ভাই, মাহবুব তালুকদার সবার বাড়িতে তাই। শুধু আমি না, সবার ক্ষেত্রেই এটা ছিলো। আমি গাছে চড়তে পারতাম না। তাদের হাটখোলার বাড়িতে ছিলো অনেক পেয়ারা গাছ। শাহাদত ভাই প্রায়ই কচিকাঁচার মেলায় আমরা যেদিন যেতাম ক্লাস করতে, ছালার ব্যাগে করে পেয়ারা নিয়ে যেতেন। আবার ওনার বাসায় এলে ছালার ব্যাগভর্তি পেয়ারা পেড়ে দিতো। এটা একদম নিয়ম হয়ে গিয়েছিলো। আমি খুব পেয়ারা পছন্দ করতাম তখন। নেত্রকোনায় গেলাম যখন, তখন আমি একটু বড়। শাহাদত ভাই আর আমার ভাই লিনু বিল্লাহ হাসাহাসি

করতে করতে এমনই ঠোকাঠুকি খেল মাথায় যে, দুজনেরই কপালে আলু হয়ে গিয়েছিলো। সেটা সুফিয়া খালারা দেখে খুব বকাবকি করলো। বেশি বকা হলো শাহাদত ভাইকে, কারণ ও ছিলো বড়।

একবার গেলাম চাঁদপুর, সেখানে মেলার অনুষ্ঠান ছিলো। আমার তো দই খাওয়া নিষেধ। খালা বার বার বলে দিয়েছে দই না খেতে, গলায় ঠান্ডা লেগে যাবে। কিন্তু আমি খালাকে ফাঁকি দিয়ে ঠিকই দই খেয়েছিলাম। এবং ঢাকায় এসে আমার হুপিং কাশি হয়ে গিয়েছিলো। ফেরার সময় শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে লঞ্চের ডেকে ভোরবেলার একটা ছবি আছে। একটা কম্বলের ভেতর শাহাদত ভাইয়ের বুকে আমি। পুরোটা কম্বল দিয়ে পেঁচানো, শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছে।

আমি সবার মধ্যে খুব বেশি আদরে বড় হয়েছি। তাই রক্তের সম্পর্কের চেয়ে বাইরের সম্পর্কগুলো আমাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে। তারপর '৭১-এ তাঁর সঙ্গে আবার একত্রিত হলাম। আলতাফ ভাই একদিন দেখলো জুন মাসের দিকে ফার্মগেটের কাছে শাহাদত ভাই উদ্‌ভ্রান্তের মতো হেঁটে যাচ্ছে। ভাইয়া তখন রাস্তা থেকে তাকে তুলে নিয়ে এলো। বাসায় তখন আবার একটা কান্নাকাটি। তারপর থেকে আমাদের বাড়িতে সব মুক্তিযোদ্ধারা আসতেন। শাহাদত ভাই তাদের নিয়ে আসতেন। দুপুর বা রাতে খাওয়া, অস্ত্র লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে মা, আলতাফ ভাই সাহায্য করতেন। এভাবে আলতাফ ভাইয়ের ২ নম্বর সেক্টরের সঙ্গে একটা যোগাযোগ হলো। আলতাফ ভাইয়ের গানগুলো শাহাদত ভাই মারফত স্বাধীন বাংলা বেতারে পাঠাতো তাঁর সঙ্গে আলতাফ ভাইয়ের মুক্তিযুদ্ধে যাবার কথা ছিলো। আগস্টের ২৮ তারিখে। কিন্তু আলতাফ ভাইয়ের কিছু গানের কাজ বাকি পড়ে যাওয়ায় যেতে পারেননি। মিনু বিল্লাহ আর মেওয়া বিল্লাহ শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে চলে গেলো। আর ৩০ আগস্ট আলতাফ ভাই আর্মিদের হাতে ধরা পড়ে। তখন কথা হয়েছিলো ৩ সেপ্টেম্বর আবার শাহাদত ভাই এসে নিয়ে যাবে। তাঁর খুব একটা কষ্ট ছিলো, আলতাফ ভাইয়ের সঙ্গে যদি দেখা না হতো তাহলে হয়তো তিনি মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতেন না এবং জীবন দিতে হতো না। এটা নিয়ে শাহাদত ভাই খুব ইমোশনাল থাকতেন। আলতাফ ভাইয়ের কথা উঠলে খুব কান্নাকাটি করতেন। তিনি ভেবেই নিয়েছিলেন ওনার সঙ্গে দেখা না হলে আলতাফ ভাইকে জীবন দিতে হতো না। এটা আমাকে খুব কষ্ট দেয়। আসলে মানুষের জীবন-মরণ তো, আমাদের কারো হাতে নাই। কিন্তু তবুও তিনি নিজেকে দোষী ভাবতেন।

ছোট থেকেই আমি যাদের সঙ্গে বেড়ে উঠেছি তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা ছাড়া অন্য কেউ না। কাজেই আমার চিন্তাধারা কখনোই অন্যদিকে প্রবাহিত হতে পারেনি। নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, ফতেহ, আলম ভাই, চুন্নু ভাই, মোর্শেদ কত মুক্তিযোদ্ধা আমার চারপাশে। নিজের ভাইয়েরা, আখতার ভাই বাদল ভাই আমি তো এদের বাইরে কারো সঙ্গে মিশি না। শুধু নাটক করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন। তবু ঢাকা থিয়েটারে রাইসুল ইসলাম আসাদ, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় এরা তো সবাই মুক্তিযোদ্ধা, আমার কখনোই কোথাও তাই সমস্যা হয়নি। আর শাহাদত ভাই তো আমার নিজের বড় ভাই। আমার কাছে শুধু এটুকুই মনে হয়, আমি আমার বড় ভাইকে হারিয়েছি আমাকে বুঝতো যে, আমার পুরো জীবন সংগ্রাম তিনি অনুভব করতেন। কারণ আমার বাবা মারা যান '৬১ সালে যখন আমার বয়স মাত্র ৪। সেই বয়সে পিতৃহারা তাই খুব স্বচ্ছন্দে বা আভিজাত্যে আমি বড় হইনি। আমি খুব দরিদ্র পরিবারের মেয়ে এবং দারিদ্র্যের মাঝে বেড়ে উঠেছি। আমার পুরো জীবনের সংগ্রাম শাহাদত ভাই জানতেন এবং বুঝতেন। যে কারণেই আমাকে অসম্ভব আদর করতেন। আমাকে সব সময় বলতেন, তুই এত ছোট তবু এত বেশি নিজের জীবন দিয়ে জীবনকে দেখেছিস এ জন্যই আমি তোকে শ্রদ্ধা করি। এটা আমার সব সময়ই মনে থাকবে। কারণ, বড় ভাই হিসেবে আশীর্বাদের চেয়ে তো বড় আশীর্বাদ আর হয় না।

এই সময়ের জন্য বলতে গেলে বলতে হয় এই বাংলাদেশ তো আমরা চাইনি। এরকম রাজনৈতিক পরিবেশ আমরা চাইনি। এ সময় সুস্থ শাহাদত ভাইকে খুব বেশি দরকার ছিলো। আমরা সবাই তো তাঁর মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকতাম। উনি গুরুজন, উনি যেটা বলবেন সেটাই আমাদের সবার সিদ্ধান্ত। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ওনাকেই আমরা গুরুজন হিসেবে মানতাম। কাজেই, আমাদের সিদ্ধান্তের জায়গাটা কিন্তু ফাঁকা হয়ে গেছে এখন।

আরো একটা স্মৃতি খুব বেশি মনে পড়ে। আমার জীবনে শাহাদত ভাইকে কখনও ছেড়ে দেইনি। তার অনেক সিদ্ধান্ত হয়তো অনেকে অনেক রকমভাবে দেখেছেন কিন্তু আমি দেখি আমার ভাই হিসেবে। আমার ভাই ১০টা অপরাধ করলেও কিন্তু আমার ভাই। '৯০ সালে শাহাদত ভাইকে আরো একবার আবেগী হতে দেখেছিলাম, তখন রাজনৈতিক কারণে শাহাদত ভাই একটু বিতর্কিত ছিলেন। একটা ব্যাপার ছিলো, প্রতি ১৬ ডিসেম্বর আমি শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতাম। এটা একটা নিয়ম হয়ে গেছিলো। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর শাহাদত ভাই, আলম ভাই বিকেল ৪-৩০ মিনিটের দিকে এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। মাকে সালাম করতে এবং বড় বোনের সঙ্গে দেখা করতে যেহেতু আলতাফ ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে সে কারণে । '৯০-এর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসটা খুব বড় করে হয়েছিলো এরশাদের পতন এবং তার পরের বিজয় দিবস। বাচ্চুকেও আমি বলিনি, বিকেলবেলা অনেকগুলো ফুল নিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন মোটামুটিভাবে সবাই তাকে ছেড়ে গেছে। সে সময় গিয়ে আমি দেখলাম বাদল ভাই বসে আছেন তাঁর বাসায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান থেকে এসে আমাকে দেখে শাহাদত ভাই বললেন, তুই আসছিস? তুই কেমন করে আসলি? আমি বললাম, শাহাদত ভাই আমি তো প্রতি বছর আসি তোমার সঙ্গে ১৬ ডিসেম্বর দেখা করতে। এ বছর কেন আসবো না সেটা তুমি আমাকে বলো? তিনি বললেন, না, আমার কাছে তো আর কেউ আসে না। আমি বললাম, কারো সঙ্গে তুমি আমাকে তুলনা করবে না। কারণ, আমি আসবোই। তুমি শত বিপদে থাকলেও আমি আসব যদি বেঁচে থাকি। এটা ১৯৭১ সাল থেকেই মনে হয়েছে আমার আসা উচিত। ১৬ ডিসেম্বর আমি আসবই। এটা কেন আমি বলতে পারব না। তখন শাহাদত ভাই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভীষণ কাঁদছিলেন। আজকে সবাই আমাকে ছেড়ে গেলেও তুই আমাকে ছেড়ে যাসনি।' তারপর শাহাদত ভাই, ভাবি, দুই বাচ্চাকে নিয়ে বিজয় উৎসবে এসেছিলাম। এবং প্রত্যেকটা মঞ্চ শাহাদত ভাইকে নিয়ে ঘুরেছি। আমি তাকে কোনো রকমের বিতর্কে জড়াতে দেইনি। আমার মনে হয়েছিলো এত বড় একজন মুক্তিযোদ্ধা ছাড়া বিজয় উৎসব হয় কি করে? এটা মনে হওয়াতেই তাকে আমি ঘর থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিলাম।

> **শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে আজন্ম একটা সম্পর্ক ছিলো সেটা অনেক ক্ষেত্রে ভাইদের চাইতেও বেশি। আমার ভাইরা আমাকে বড় করেছেন কিন্তু যে আদরটা শাহাদত ভাই আমাকে দিয়েছেন সেটা বড় ভাইয়ের দাবি থেকে**

সেলিনা ভাবী যখন দ্বিতীয় সন্তানসম্ভবা তখন আমিও সন্তানসম্ভবা। প্রায়ই আমার হাটখোলার বাসায় যাওয়া হতো এবং আমাদের তিনজনের সন্তান হবে। ছোটভাই মোরশেদের স্ত্রীও সন্তানসম্ভবা। আমরা ৩ জন এক সঙ্গে বলে গল্প করতাম। হাসাহাসি করতাম। আমি একদিন শাহাদত ভাইকে বললাম জানো, আমার না মেয়ে হবে। আমি সব সময় চাই মেয়ে হোক আর বাচ্চু বলেছে ওর ৭টা মেয়ে দরকার। আমি আমার মেয়ের নাম রাখবো এষা। তিনি বললেন, নামটা তো খুব সুন্দর। আমার সাশার সঙ্গে এষাটাও খুব মিলবে। মেয়ে হলে তোর মেয়ের নামও এষা রাখিস, আমার মেয়ের নামও হবে এষা। আমাদের দুজনেরই মেয়ে হলো এবং তাদের নাম রাখা হলো এষা। একজন এষা চৌধুরী, একজন এষা ইউসুফ।